The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

বাঙালির সংগীত ধারার উৎস-সন্ধানে

[Discovering the core of the style of Music of the Bengalis Pedagogy in performing arts, Music (theory & practical)]

Dr. Krishna Pada Mondal
Professor , Department of Music, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 27 February 2025
Received in revised: 23 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Veda, Banga, Rigveda, Acharya Deva, Charyapada, SrikrishnaKirtan, Oromia, Ahmia, Music of Hindustani

ABSTRACT

There is a deep-rooted connection between the Indian and Bengali styles of music in both terms of culture and anthropology. In the Vedas, sages have sarcastically compared Bengalis to birds while discussing music. According to experts, Bengalis were accustomed to a gypsy lifestyle making them mix and match with different cultures and people. Most Bengalis can be connected back to old-Australian and Mongolian-Dravidian ancestry. Originally, the word "Banga"(বঙ্গ) was associated with ethnicity rather than the landmark. There have been recordings in the Rigveda (ঋকবেদ) of how the "Bangas" did not accept Sage Acharya Deva`s (আর্যদের) invitation for Yoggya. Therefore, it would be imprecise to state an independent style in Bengali music can be detected depending only on the current or old-wider landmark of Bangla and/or the old manuscripts in the language. In fact, the incorporation of the music of Bangla with other languages and cultures is not a history at all, it is an active process. For instance, while traditionally Raag-sangeet in Bangla is often associated with Hindi, more recently English, Oromia, and Ahmia has also been comprised opening a new chapter for exploration. This also reaffirms that Raag-Sangeet can be performed in any language. While Bengalis had started performing and practicing Raag-sangeet in the Bangla language during the revolution period (18thcentury). Later the discovery of Charyapada [7^{th}-9^{th} century] and SrikrishnaKirtan [12^{th}-13^{th} century] has changed the outlook on the association of the language with Raag sangeet. These ancient manuscripts suggest the longstanding connection of Bengalis with the creation and utilization of raags going as far as to detect hints of regional dialects in the style of specific raags` nature. Until the deviation of the North-South style of Indian music [Sangeeratnakar] in the 13th century, the original style of Indian music had been deeply familiar with Bengalis and the trace of this longstanding alliance can still be seen. Although, this deviation presumably has affected the use of dialects and style of performance, most experts agree that the birth of the art of raag-sangeet has come from the same place. Additionally, the contributions of Bengalis to the prosperity of Indian raag-sangeet can be factually demonstrated. It is imperative to celebrate the way the music of Hindustani has preserved its riches and developed an ever-progressing body of art. This article shall discuss the application of the Bangla language as a tool for interpreting the ethnicity of 'Banga' and the contributions of Bengalis in establishing an enriched style of music in the North of India.

ভূমিকা

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় ভারতীয় সংগীতের সাথে বাঙালিদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। "প্রাচীন বৈদিক সংগীতের আলোচনাতেও বাঙালিদের নিন্দার ছলে পাখীর সাথে তুলনা করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।"[১] অর্থাৎ সংগীতপ্রেমী বাঙালিরা প্রাচীনকালে এক ধরণের যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। "বাঙালিরা একটি শংকর বা পাঁচমিশালী' জাত। তাদের ধমণিতে প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয় ও মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয় রক্তধারা প্রবাহিত।'"[২] '' বংগ' শব্দটি প্রাচীন কালে জাতিবাচক ছিল, দেশ-বাচক নয়। ঋগ্বেদে বংগ জাতির উল্লেখ আছে যারা আর্যদের যজ্ঞের আমণ্ত্রণ গ্রহণ করেনি।"[৩] তাই কেবলমাত্র বর্তমান বা প্রাচীন ও বৃহত্তর বংলার ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে অথবা বাংলা ভাষায় রচিত তথ্য-উপাত্তের আলোকেই বাঙালির সংগীতধারার প্রকৃত ইতিহাস আবিস্কার হয়তো সম্ভব নয়। যেমন আধুনিক কালেও রাগসংগীত চর্চায়

বাঙালিরা হিন্দি বা ভারতীয় অন্যান্য ভাষা ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আবার সম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ থেকেই ভারতীয় (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধারায়) রাগসংগীত চর্চার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচণা হয়েছে যা নতুন প্রজন্মের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য অত্যন্ত যুযগাপযোগী। "বাংলাদেশের জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র বেতার ও টেলিভিশনে ইংরেজী ভাষায় রাগসংগীত শৈলীর খেয়াল পরিবেশনা প্রচারিত হচ্ছে এবং মঞ্চে ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ (ইংরেজী) ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি চর্চার প্রসার প্রচার শুরু হয়েছে।"[৪] কণ্ঠসংগীতের সকল শৈলীতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের গায়কীতে রাগের প্রয়োগিক বিষয়াদি ইংরেজী ভাষার লিরিক বা বাণীসহ পাশ্চাত্যের সোলফেজ (রাগ অনুযায়ী) উড় জব গব ঋধ ঝড় খধ ঞর ব্যবহার করে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মতো রাগ পরিবেশনা সম্ভব। বাঙালিরা, পাশাপাশি মাতৃ ভাষাতেও এই ধারাকে নবজাগরণ পর্ব থেকে লালন করছে। আরো অনেক গুলি কারণে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ধারার কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যকলা পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করার জন্য বাঙালিদের অবদান রয়েছে। বর্তমানে উত্তর ভারতীয় সংগীত ধারায় অসংখ্য বাঙালি সংগীত-গুরু (৬০%) কোনোনা কোনোভাবে এই মৌখিক পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁরা বিশ্বব্যাপী তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করে সংগীত চর্চায় নিয়োজিত আছেন। ভারতীয় সংগীতের সাথে বাঙালিদের যোগসূত্র যে প্রাচীন কালেও ছিল তা অনুমান করা যায় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বাঙালিদের সৃজনশীলতায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে। যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হলো ভরতনাট্যশাস্ত্রে (৩য় শতাব্দী) বর্ণিত গৌড়ীয় নৃত্য এবং প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার কঠিন শাসনকে এড়িয়ে হাজার বছর আগে বাংলা ভাষায় রচিত চর্যা গানের মাধ্যমে রাগসংগীত চর্চা। এতে বৌদ্ধ ধর্মীয় সাধনা ও রাগসংগীতের মাধ্যমে অধ্যাত্ম দর্শনের সমন্বয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের বাণীতে রূপকের আড়ালে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চেতনার সমন্বয় ও বাংলার সমাজচিত্র লক্ষ্যণীয়। আধুনিককালের বিভিন্ন সাধকদের মাধ্যমে এই ধারা বাঙালির সংস্কৃতি ও চেতনায় প্রবহমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ধারা হিসেবে বিভাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে ভারতীয় সংগীতের আদিরূপের সাথে বাঙালিদের গভীর সংযোগ ছিল এবং বাঙালিয়ানায় ভর করেই গভীর আত্মপ্রত্যয় তৈরী হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ধারাতেও এই রাগসংগীতের প্রভাব কিছুটা হলেও বর্তমান। ভারতীয় সংগীতে সর্ব প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় এই দু'টি সংগীত ধারার বিভাজন বিষয়ে পণ্ডিত সারংদেবের (১৩শ শতাব্দী) সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনুমান করা য়েতে পারে উল্লেখিত বিভাজন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং গায়কীর বা পরিশেনার রীতির জন্য প্রযোজ্য হলেও রাগসংগীতের উৎস যে এ্কই ছিল সেবিষয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সহমত পোষন করবেন এবং বাঙালিরা যে রাগসংগীতের বিকাশে রাগ সৃষ্টিসহ গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাও পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রমাণ করা যেতে পার। বাঙালিরা ভারতীয় তথা বর্তমান হিন্দুস্থানি সংগীত ধারার মধ্যে স্বতন্ত্রতা তৈরি না করেও যেভাবে নিজস্বতা বজায় রেখেছে এবং একটি প্রগতিশীল চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে তার উৎস সন্ধান; এছাড়া নৃতাত্বিক জাতিসত্তায় বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য স্থাপনে বাঙালিদের প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাসহ 'বাঙালির সংগীতধারা'র নামকরণ বিষয়ে যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রবন্ধটিতে পর্যালোচনা করা হবে।

বিষয় বিবরণ

ভারতীয় সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ধর্মানুগ মণ্ত্রসংহিতায় বৈদিক যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার অত্যাবশ্যক ছিল। আর সেই সূত্রে ভারতীয় প্রায় সকল ভাষার জন্মসূচনায় সংস্কৃতের প্রভাব রয়েছে। তবে, কোনো কোনো ভাষাবিদদের মতে বাংলা ভাষার বিকাশে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত অনেক ধারণাই অস্পষ্ঠ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "বাংলা ভাষায় তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ বা উপাদানের পরিমাণ ৪৪%, তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত) ও দেশীয় (লোকজ) ৫১.৪৫% এবং বিদেশী ৪.৫৫% ।"[৫]

কিন্তু সংগীতের স্বর বা সুর-শ্রুতির গভীর আকর্ষণের কারণে বাঙালিদের কখনো ভাষার প্রতিবন্ধকতা পোহাতে হয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিককালেও এর প্রমাণ হিসেবে রাগসংগীত চর্চায় হিন্দি ভাষার প্রয়োগ বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়। তবে প্রাচীনকালে বাঙালিদের সংগীতধারার বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্তের অভাব থাকলেও তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতনাট্যশাস্ত্রের সময়কালে বাঙালিদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়েছিল বলা যায়। সংগীতের চর্চায় সামবেদের (খৃ. পূর্ব. ৫ম শতাব্দী) পরে এই 'ভরতনাট্যশাস্ত্র'কে পঞ্চম বেদ হিসেবে মানা হয়ে থাকে। ড. মহুয়া মুখর্জীর মতে ঃবাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন, নাট্যশাস্ত্রের সময় বা তারও আগে থেকে; যার ফলে নাট্যশাস্ত্রে এর উল্লেখ পাই। গৌড়ীয় নৃত্যপদ্ধতি গভীরভাবে নাট্যশাস্ত্রানুসারী। এতে গৌড়ীয় নৃত্যকলার বিকাশের বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে বাঙালির সংগীত ধারার বিষয়ে আরো স্পষ্ঠ ধারণা মেলে। অর্থাৎ গৌড়ীয় নৃত্যকলার সাথে সাথে কণ্ঠসংগীতের ভাষা ব্যবহার ও তালবাদ্যযণ্ত্রের সমন্বয়ের বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। নৃত্যকলার জন্য গান এবং বাদ্যযন্ত্রানুগ বৈচিত্র অপরিহার্য। ভরত নাট্যশাস্ত্রের পরে "চর্যাপদের যুগে অনুপ্রবেশের আগেই বাংলা ভাষায় রচিত গান একটি মৌখিক পরম্পরার সৃষ্টি করেছিল। কেননা প্রাচীন বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি ('চর্যাপদ') একদিকে যেমন ভাষার গঠন পৃকৃতির জন্য যথেষ্ট পরিপক্ক অন্যদিকে রাগসংগীতের লিখিত উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয়।"[৬] যে কারণে বাঙালির সংগীতধারার প্রারম্ভ অতি প্রাচীনকালেই হয়েছিল তা অনেকাংশেই নিশ্চিত। বলা যায় চর্যাপদের গানে রাগসংগীতের প্রবন্ধ শ্রেণীর ধারার

মাধ্যমে ধর্মানুগ সংগীত চর্চার একটি জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, বৈদিক সংগীতের আধ্যাত্মিক (মার্গ) এবং জাগতিক (তান্ত্রিক) সংগীত সমন্বয়ের সময় সামবেদের (সামগান) গান ও স্বর-সপ্তক নির্মাণে এমনই একটি প্রচেষ্টা প্রতিষ্টিত ছিল। যদিও এই সময়ে সপ্তকের স্বর গুলি (ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও আতিমশার্য) অবরোহাত্মক ছিল। যা আধুনিক কালের যেকোনো ধর্মীয় সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময়ে উচ্চ স্বর থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকের স্বর ব্যববহারের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই সামবেদকালীন সময়ে বাঙালিদের অন্তত লোকজ-তান্ত্রিক সংগীতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল এমন ধারণা অমূলক নয়।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর আগমন ও পরস্পারিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সমন্বয়ে এই সংগীতধারা সমৃদ্ধ। আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন আনুমানিক চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। বাঙালির পূর্বপুরুষগণ (নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায়) তখনও সুরের রাজ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁরা চর্যাযুগে উত্তর ভারতের কতিপয় প্রধান অঞ্চলিক ভাষার মধ্যে বাংলাকে অনুস্মরণ করেছে।

অনুরূপভাবে, সংগীতের মধ্যযুগের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংস্কৃত ভাষার পৃষ্টপোষকতা পেয়ে বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম' রচনা করেন। জয়দেব দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত রামানুজের দারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই গীতগোবিন্দমের অনুকরণেই বড়ুচণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছেন যখন ফার্সী ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অনুসৃত হচ্ছিল। বাঙালির সংগীত চর্চায় এর প্রভাব পরবর্তীতে অনেকগুলি শৈলী বা প্রকরণের মধ্য দিয়ে প্রবহমান যা অদ্যাবধি বাংলা গানে প্রভাব বিস্তার করছে। (এই প্রবন্ধে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়ে পরে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হবে।) বাঙালির ঘরানাকেন্দ্রিক সংগীত চর্চা এই চর্যাযুগ থেকে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। আর এই ঘরানার প্রভাবে ও ধর্মানুগ সাধনতন্ত্রের মাধ্যমে বাঙালির রাগসংগীত চর্চা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রসারলাভ করেছিল যার কেন্দ্রস্থল ছিল প্রাচীন বিশাল ভূখন্ড বঙ্গভূমি।

বাঙালির সংগীতধারার বিকাশে ভৌগলিক অবস্থানকে অনেকাংশে গৌণ ভাবা হলেও বাঙালিদের অবস্থান আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেকারণে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ধারায় বাঙালি সংগীতজ্ঞদের যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, রাগসংগীতের রাগস্বরূপ সৃষ্টি, গুরুমুখী শিক্ষার শুরু বা পরম্পরা সৃষ্টি সকল ক্ষেত্রেই বাঙালিরা এগিয়ে ছিল। তারা বিভিন্ন জনপদে বসতি স্থাপন করেছে, এবং কৌম্য সমাজ ব্যবস্থার কারণে তখন জনপদসমূহের নামকরণ করা হতো। ড. নীহাররঞ্জণ রায়ের মতে "ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব-ভারতের যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল তার সীমানা এরূপ, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রক্ষপুত্র নদীর অববাহিকা, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, বর্ধমান বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড় পরিবেষ্টিত এলাকা এবং পশ্চিমে ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যরাজ্য"।[৭] তবে বাঙালির প্রাচীন সংগীতধারার পীঠস্থান ও উন্নয়নের জন্য রাজা শশাংকের (৫৯০-৬২৫) সময়কাল থেকে পরবর্তী পাল বংশীয় রাজাদের চার শত বছরের শাসন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বাঙালি সংগীতজ্ঞদের নেতৃত্বে বিশেষ করে রাগসংগীতের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা এই সময়েই শুরু হয়েছিল। আর বৈদিক সংগীতের মার্গ/দেশী (যা উচ্চাঙ্গ সংগীত ধারার বলে বিবেচিত)-এর বিপরীতে তাণ্ত্রিক সংগীত বা লোক সংগীত রীতির যে বিকাশ ঘটেছিল এই উভয় ধারারই সমন্বয় হয়েছে বাঙালির রাগসংগীত র্চচার মাধ্যমে চর্যাপদে এসে। অর্থাৎ উত্তর ভারতীয় সংগীত চর্চায় বাঙালিদের অবদানকে কোনোভাবেই অবমূল্যায়ন করার সুযোগ নেই। যেকারণে বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীত ধারার শুরুর নামকরণ বাঙালির সংগীত ধারা বলে অনকাংশেই দাবী করা যায়। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত সারংদেব তাঁর 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে প্রথমবারের মতো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ধারার কথা উল্লেখ করেছেন, তথাপি বতমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অনুমান করা যেতে পারে যে, তা কেবলই গায়কী এবং ভাষাগত পাথক্য হিসেবে স্পষ্ট ছিল। এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় ধারায় সপ্তকে স্বরের নামকরণের সাথে অদ্যাবধি 'শ্রুতি'র নাম ব্যবহৃত হলেও প্রায়োগিক বিষয়ে রাগের মধ্যে বৈষম্যতা খুবই ক্ষীণ। উত্তর ভারতের সপ্তকে বতমানে পাশ্চাত্যের স্বর-ব্যবস্থার (ডায়টনিক স্কেল) প্রভাব থাকলেও তা রাগসংগীতের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং শ্রুতি অনুযায়ীই রাগে স্বর ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের রাগের ব্যক্তিতের সাথে স্বরের শ্রুতিরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গুর্ত্বপূর্ণ।

ড. প্রদীপ কুমার ঘোষের মতে "খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে আরম্ভ করে ১৫শ খ্রিষ্টীয় শতক পর্য্ন্ত বাংলায় যত প্রকার রাগাশ্রিত গান প্রচলিত ছিল সেগুলিকে একত্রে বলা হতো প্রবন্ধ।"[৮] 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র সপ্তকে শ্রুতি বিভাজন ব্যবস্থা (সা, মা, পা এর প্রত্যেক স্বরের চারটি করে শ্রুতি; রে ও ধা এর তিনটি করে এবং গা ও নি এর দুটি করে মোট বাইশটি শ্রুতি সারণা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত) রাগরঞ্জকতা বা রাগ সৃষ্টির জন্য অদ্যাবধি গুরুত্বর্পূণ। পণ্ডিত মতঙ্গের (৫ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশী গ্রন্থে সর্বপ্রথম আধুনিককালে প্রচলিত রাগের বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট রয়েছে। ভরতনাট্যশাস্ত্রের গ্রামরাগ ও জতিরাগের সাধনার মধ্যেই নিহিত ছিল রাগের ব্যক্তিত্ব। এই সময়ে বাঙালির গুরুমুখী শিক্ষা-পরম্পরা শুরু হয়েছিল ধারণা করা যেতে পারে। চর্যাপদের বাণী ও রাগরূপের বিকাশ প্রাথমিক ভাবে মৌখিক পরম্পরায় ণিশ্চিত হলেও পরবর্তী সময়ে

সংগীতের রাগ রূপের চর্চার কারণে এগুলি লিখিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। চর্যাপদের ভাষা বাংলা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলিক ভাষার সমন্বয় থাকলেও গানের বাণীতে কয়টি বাংলা শব্দ আছে সেই বিচারে রাগসংগীত বা রাগরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। গানের শিরোনামে উল্লেখিত রাগের যে নাম রয়েছে তা কল্পনাপ্রসূত হতে পারেনা। সবদিক বিবেচনায় চর্যার কাব্যিক রূপের সাথে রাগসংশ্লিষ্টতা বাঙালির সংগীতধারাতে এসে পূর্ণতালাভ করেছে।

বৈদিক সংগীতের সময়ে প্রচলিত দু'টি ধারার (মার্গ ও তান্ত্রিক) মতো আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চেতনার সমন্বয় রয়েছে চর্যাপদের বাণী ও সুরে যা গুরুমুখী পরম্পরা ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ধারার ঐক্য ছিল এই সময়ে। হতে পারে সেন রাজত্বকালের সময়ে দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাষা ও রাগসংগীতের আদান প্রদান ছিটা হলেও হয়েছে। তবে একই উৎস (বৈদিক সময়) থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে ১৩শ মতাব্দী পযন্ত উভয় ধারার গায়কী অভিন্ন ছিল। সেকারণে বাঙালিদের সৃষ্ট অনেক রাগই অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। যেমন 'শবরী (সাবেরী দক্ষিণ ভারতে) 'বঙ্গাল' 'মল্লার/ (মলহরি দক্ষিণ ভারতে) এগুলো উত্তর ভারতে রাগাঙ্গের রাগ হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে ভৈরব রাগাঙ্গের রাগ হিসেবে প্রাচীনতম গুরুত্বপূর্ণ একটি 'রাগাঙ্গ' রাগ। ভৈরব রাগাঙ্গের প্রায় অর্ধশতাধিক রাগ প্রচলনে রয়েছে)। 'শিবরী' রাগের প্রচলিত নাম 'শ্রী' (এই রাগটিও একটি রাগাঙ্গের প্রধান রাগ); শবরী/শবরি নামের রাগটি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 'সাবেরী' নামে প্রচলিত। শাবিরী রাগটি প্রাচীন রাগ-রাগিণী স্বরূপের মধ্যে মেঘ রাগের রাগিণী হিসেবে অদ্যাবধি প্রটলিত। "'পটমঞ্জরী' রাগটি (যদিও একাধিক স্বরূপ রয়েছে) বঙ্গাল অঞ্চলের বিলাবল হিসেবে পরিচিতি। এছাড়া গৌড়, দেশগৌড়, গুঞ্জরী, কহুগুঞ্জরী ইত্যাদি রাগ দক্ষিণ ভারতে প্রায় একই স্বরূপে প্রচলিত।"[৯]

চর্যার ২৩ জন পদকর্তা সকলেই রাগস্রষ্টা না হলেও রাগসংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যেকারণে প্রত্যেকের নামের ভণিতাযুক্ত পদের উপরে রাগের নাম স্পষ্ট রয়েছে। "এঁদের মধ্যে রাগস্রষ্টা হিসেবে কাহ্নপাদ'র নাম স্মরণীয়। রাগ কহু' বা কহুগুর্জরী তাঁরই সৃষ্ট বলে অনুমান করা যেতে পারে। বর্তমানে গুর্জরী রাগটিকে টোড়ি রাগাঙ্গের রাগ হিসেবে মানা হয়, তাই এই কহুগুর্জরীর স্বরূপটি আধুনিক কালের টোড়ি রাগাঙ্গের ভূপাল টোড়ি (সা ঋা জ্ঞা পা দা র্সা) হিসেবে প্রচলিত আছে।[১০]

যেকোনো ভাষার বিবর্তন যেমন দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্ষর বা সংকেত চিন্হ (বর্ণরূপ) গ্রহণ করে, আর ভাষাবিদগণ এগুলির স্থায়ীরূপ ধারণে এগিয়ে আসেন। তেমনি বাঙালি সংগীতজ্ঞদের মধ্যে পরম্পরা সৃষ্টি এবং সুরের চর্চা রাতারাতি হয়নি। বাঙালিদের আঞ্চলিক ভাষা এবং সাংগীতিক একটি মৌখিক পরম্পরা অর্জনের পরেই চর্যাপদের মতো নিপুণ লিরিক সৃষ্টি হয়েছিল। রাগসংগীতের জন্য উচ্চাঙ্গ বা প্রবন্ধ শ্রেণীর শৈলীতে চর্যার গানের বাণীতে বৌদ্ধ বাঙালি সাধকগণ আধ্যাত্মিক সাধনায় জাগতিক উপমা অলংকার ব্যবহার করেছেন। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই শিক্ষার প্রচার প্রসারে শিষ্যও তৈরী করেছেন অর্থাৎ রাগসংগীতের গুরু পরম্পরাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বর্তমান ভারতে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহার (৫ম মতাব্দী,বিহার), ওদন্তপুরী মহাবিহার (৮ম শতাব্দী বিহার), বিক্রমশিলা মহাবিহার (৮ম শতাবদী ভাগলপুর); এবং বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার (নওগাঁ ৭ম শতাব্দী) . শালববন মহাবিহার (কুমিল্লা, ৭ম মতাব্দী) সহ এ অঞ্চলে সহস্রাধিক মঠ ও বৌদ্ধবিহারের কোনো কোনোটিতে সংগীত শিক্ষার গুরু পরম্পরা প্রতিষ্ঠতি ছিল। পাল বংশীয় রাজাগণ পৃষ্টপোষক হিসেবে অত্যন্ত উদার ছিলেন। সিদ্ধাচার্যগণ শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন মঠ ও মহাবিহারে স্থানান্তরিত হতেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে তিব্বত, চীন, কোরিয়া, ও মধ্য এশিয়ার পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা করতে আসতেন। যেমন সোমপুর বা পাহাড়পুর মহাবিহার নালন্দা মহাবিহারের সাথে তুলণীয়। দশম শতাব্দীতে এই বিহারের আচার্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তৎকালিন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য সময়সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু ধর্মানুগ জ্ঞান অর্জন ও সাধনার ঐকান্তিকতায় কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি বা অসম্ভব ছিলনা।

উপসংহার

কোনো রাগের স্বরূপ সম্পর্কে লিখে বোঝানো অধুনিক কালেও সম্ভব নয়। রাগের ভাবরস বা ব্যক্তিত্ব গায়কীর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়। বতমানে প্রযুক্তি উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবহার সত্তেও রাগের প্রশিক্ষণের জন্য গুরুর বিকল্প সম্ভব নয়। এমনকি সম্প্রতিক সময়েও অনেক গুরুই তাঁদের শিষ্যদেরকে গানের বাণী লিখতে নিরূৎসাহিত করেন। অথচ হাজার বছর আগে বাঙালি সংগীতজ্ঞগণ এবিষয়ে যথেষ্ট উদার ছিলেন। ধর্মীয় সাধনতণে্ত্রর পথ যেমন গুরুর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার মতো একটি অধ্যাত্ম-দর্শন, তেমনি সংগীতের সাধনায় গুরু অনিবার্য এবং গুরু ছাড়া সুর-সংস্কৃতির বিকাশে একটি ব্যবহারিক বিমূর্ত শিল্পের নাদাত্মক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। বাঙালি বৌদ্ধ সিদ্ধাচাযগণ এই রাগসংগীতে পারদর্শী হয়েছেন পাশাপাশি সাধনতন্ত্রের গূঢ় রহস্যের ব্যবহারিক জ্ঞান সংগীতে ধারণ করেছেন। সুরের সম্মোহনী শক্তির সাথে বাণীর মিশ্রণক্রিয়া বৈদিক যুগেও ছিল যা মার্গ সংগীত হিসেবে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্দাচাযগণ বাণী ও সাধনার স্থায়ী রূপ রাগসংগীতের মাধমে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছেন এবং শিষ্যদের মাঝে প্রশিক্ষণের একাগ্রতায় তা বিতরণ করতে চেয়েছেন। যেমন আধুনিককালেও অধ্যাত্ম-দর্শন সমৃদ্ধ তান্ত্রিক বা লঘুসংগীত প্রকরণের যে কোনো ধারার বিষয়ে

গবেষণায় শেষ পর্যন্ত রাগসংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। জাতিসত্তার চেতনার সাথে সাথে ভাষার আঞ্চলিকতার বলিষ্ট বৈষশষ্ট্য স্থায়ীরূপ ধারণে যখন সংগঠিত হয়, তখন রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা ও অস্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে সব সময়ই সংগঠিত হয়ে যেকোনো মূল্যে আংশিকভাবে হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেকারণে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসকগণ বিভিন্ন সময়ে বাঙালিদের ওপর ধর্ম ও মত প্রতিষ্ঠায় সাংস্কৃতিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালির সংগীত ধারার উন্নয়নে মধ্যযুগের শুরুতেই হিন্দু ধমমত সেন রাজাদের (বল্লাল সেন ৯০০ থেকে লক্ষণ সেন ১২০০) দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃত ভাষার নব্য-স্বরূপ গ্রহণে কিছুটা অস্থিতিশীল সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। আবার মুসলীম শাসন (১২০৪-১৬০০) অমলে সংস্কৃতের পরিবর্তে ফার্শীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর আগে গুপ্ত এবং পাল রাজাদের শাসন আমলের সংস্কৃতিতে বাঙালিদের মধ্যে ধর্ম ও সংগীত চর্চায় ভাষার প্রতিবন্ধকতা ছিল না; কিন্তু সেন রাজাদের শাসন আমলে সংস্কৃত ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যদা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য পায় যার প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ ধর্মমত ও সংস্কৃতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে শুরু করে। সম্ভবত এই সময়ের মধ্যেই চর্যাগীতির সাধকগণ নেপালে বসতি স্তাপন করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগের (১২০১-১৩৫০) মতো বিষয় ভাবা হলেও সংগীতের ক্ষেত্রে বলা যায় এমনটি ছিলনা। কেননা প্রবাসান্তর সংগীতজ্ঞদের কারণেই এই ধারার বিস্তৃতি বজায় ছিল আর সংরক্ষিত ছিল বাংলা ও বাঙালির জাতিসত্তার অমূল্য সম্পদ চর্যাপদ নেপালের রাজ-লাইব্রেরিতে। বাঙালি জাতিসত্তা বাংলা ভাষার পরে সংস্কৃত ও ফার্শী ভাষাকেও বৃহত্তর আবাসভূমিতে সংগীত উপযোগী ভাষা হিসেবে মানিয়ে নিয়ে ছিল। আধুনিককালেও প্রবাসান্তরে যেকোনো নৃতাত্বিক জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠায় বাঙালিরা তৎপর এবং সে বিষয়ে জাতিসংঘের সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। চর্যাপদ যুগের পরে বাঙালিদের সংগীতধারার বিকাশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে ব্যাপক রাগের ব্যবহার হয়েছে। কীর্তনের ঘরানার পরবর্তী বাংলার বিষ্ণুপুরের ঘরানার প্রভাব বাঙালির সংগীত ধারা বর্তমান সময়ের সংগীত চর্চার প্রসার ও প্রচার বিশ্বব্যাপী লক্ষণীয় ।

তথ্যনির্দেশ

১ নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস 'প্রাচীন বঙ্গের অবস্থান ও বঙ্গ নামের উৎপত্তি বিচার A Research Journal of Faculty of Arts, RU

২ নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্বে (কলকাতা দেজ পাবলিশিং ১৯৯৩) পৃ ৬২-৭১; আরো Nitish Sengupta, Land of Two Rivers: A History of Bangal from the Mahabharata To Mujib, (New Delhi: Penguin Random House India, 2011) p. 3

৩ সৈয়দ আলী আহসান; প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তা: ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত' সম্পাদক- সফর আলী আনন্দ, বাঙালির আত্মপরিচয়, আই বি এস রা, বি, প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

4 Professor Dr. Krishna Pada Mondal, Article ÔA New Era of Indian Classical Vocal Music: English Dhrupad Khyal and Thumri Ô Peper pregentation and (online) lecture demonstration and performance, CREATIVE-2025, Organized 3 days(24 - 26th Feb.) International Seminar by Visva-Bharati University, Shaniniketan, India, Dated 26th February 2025. Attached the article with English Dhrupad, Khyal and Thumri's performances 14 eference links. https://docs.google.com/document/d/1dCUakjf_F9hC-ZlUhme5nW5vjSTziRbz/edit?usp=drive_ link&ouid= 114441805648475643510&rtpof=true&sd=true

৫ গ্রন্থ: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ১৯৫০, পৃ, ৫৪) আরো সৌরব সিকদার, ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা, (ঢাকা: অনন্যা ২০১৪), পৃ, ২১৪; নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, বাংলা ভাষার উৎস পৃ, ১৯।

6 Professor Dr. Krishna Pada Mondal, Article, "The Sperituality of Bengali Folk Songs in Ragasangeet: Charyapada "Peper pregentation and (online) lecture demonstration and performance, VIRASAT -2025, Organized 2 days (6-7 March) International Seminar by Visva-Bharati University, Shaniniketan, India Dated 7th March 2025. Attached the article with performances 11reference links https://docs.google.com/document/ d/1Jx_hOdcvDAEc-uHWVHiuL0ZVWnLpYsfB/edit?usp=drive_link&ouid=114441805648475643510&rtpof= true&sd=true

৭ নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২-৭১; আরো Nitish Sengupta, Land of Two Rivers p. 3.

৮ ড, প্রদীপ কুমার ঘোষ, 'বাংলায় সংগীত চর্চার ধারা,' কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৯ পৃ, ৯।

৯ ড, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, বাংলার রাগসংগীত প্রথম খণ্ড 'প্রথম অধ্যায় ,চর্যাপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশন, ২০০৬, আরো আই বি এস জার্নাল রা, বি ২০৩।

১০ ড. কৃষ্ণপদ মণ্ডল, প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়।